উপন্যাস কথা

সুমিতা চক্রবর্তী

বাংলা সাহিত্যে গ্রামের পটভূমি অনেক আছে কারণ বাংলা তথা ভারত আজও গ্রাম - প্রধান দেশ। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে মনে রাখার মতো গ্রামের নাম সবসময় লেখকেরা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেন না। বাংলার গ্রামের প্রতিনিধিত্ব করবার দাবিতে সবচেয়ে এগিয়ে আছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নিশ্চিন্দিপুর। অশনিসংকেত আর ইছামতী-তে বিশেষ একটি গ্রামকে তুলে ধরলেও গ্রামের নামগুলি যেন অস্পষ্ট। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়েরও অবলম্বন গ্রাম — বেশ নির্দিষ্ট ও আঞ্চলিক গ্রাম — তবু নামগুলি মনে থাকে না। কীর্তিহাটের কড়চা-র 'কীর্তিহাট' মনে রাখি উপন্যাসের নামেই তার স্থান বলে; আর পঞ্চগ্রাম-এর পাঁচটি গ্রামের মধ্যে 'মহাগ্রাম'ই বিশেষভাবে স্থানপট। হয়তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি-র 'কেতুপুর' আর পুতুলনাচের ইতিকথা-র 'গাওদিয়া'র নামই পাঠকদের মনে আর একটু জায়গা করে নিয়েছে। তবে মনে থাকে ঢোঁড়াই চরিতমানস-এর আধা-গ্রাম আধা - শহর 'জিরানিয়া', 'তাৎমাটোলি' ঠিক পূর্ণ গ্রাম নয়। একটি পাড়া। একটু পিছিয়ে গেলে ত্রৈলোক্যানাথ মুখোপাধ্যায়ের কঙ্কাবতী উপন্যাসের 'কুসুমঘাটী', রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে-র 'শুকসায়র' একটু যেন স্মৃতিতে ভেসে ওঠে।

এর কারণ বোঝাই যায়। গ্রামগুলি নিদিষ্ট ভৌগোলিকগ্রাম অনেক সময়েই নয়; যে কোনো গ্রামেরই ছবি, তাই যে কোনো নামেই চলে। সেজন্যই প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়ের নিখুঁতভাবে একালের একটি গ্রামকে উপন্যাসের পটভূমি করলেও সেই গ্রামের কোনো নামই দেননি তাঁর কথা নামের সাম্প্রতিক উপন্যাসে (প্রথম প্রকাশ ২০০৬, প্রতিভাস)

উপন্যাসের নাম কথা। আগে বলে নেওয়া যাক গল্পটা। শেষ পর্যন্ত সেই গল্পই লেখকের কথা তুলে ধরে, আলোচকের ভাষ্য নয়।

হিন্দু ও মুসলমান পরিবার মিলিয়ে একটি গ্রাম। নানা ধরনের মানুষ —নারী ও পুরুষ আছে গরিব চাষি; নিষ্কর্মা বেকার; সম্পন্ন জমি-মালিক ও ব্যবসায়ী; আছে রাজনীতির লোকজন; থানার বড়োবাবু, মেজোবাবু; আছেন সকলেন কাছে শ্রদ্ধার পাত্র এক প্রবীণ পিরসাহেব। অধিকাংশ চরিত্রই কম-বেশি খারাপ; একটি-দুটি মানুষ ভালো — যেমন পৃথিবীতে হয়ে থাকে। সুযোগসন্ধানী বিত্তবানের হাতে দরিদ্রের রিক্ততর হবার পর্যায় দেখানো হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসটির সম্পাতবিন্দু হল পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর শোষিত ও অসহায় অবস্থান। দরিদ্র পরিবারে নারীর অবমানিত জীবনযাপন। তবু পুরুষ - প্রতাপ আর নারীর মর্যাদার মধ্যে সংঘাতের জন্ম হয়। উপন্যাসের শেষে নারী-শক্তির জেগে ওঠার পট-পরিবর্তন আমাদের কিছুটা তৃপ্তি দেয়।

উপন্যাসটির নাম কথা। ঔপনাসিক প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সংঘাতকে সাবয়ব করে তুলেছেন কথা আর 'না-কথা'র দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। অবশ্যই মূল সংঘাত কেবল কথা-সর্বস্ব নয়, অনেক বেশি বাস্তব। সেখানে চতুর বড়োলোক দরিদ্র দুর্বলের জমি হাতিয়ে নেয়, নষ্ট করে দেয় পুকুরের মাছ। সেখানে লুব্ধ পুরুষ নারী-শরীর ভোগের জন্য যে কোনো উপায় অবলম্বন করে। সেখানে প্রভুত্ববাদী পুরুষ সর্বতোভাবে পীড়ন করে নারীকে। সেই সঙ্গে কথা-র সংঘাত খানিকটা প্রতীকী নয়। বহু যুগ আগে থেকেই 'কথা' অর্থাৎ 'শব্দ' অর্থাৎ 'ভাষা' মানুষের কাছে শোষণের অস্ত্র রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। আজও তা প্রায় সমানই সত্য।

কথা আবিষ্কৃত হয়েছে সভ্যতায়। ধ্বনি-সমবায়কে নির্দিষ্ট অর্থ সংলগ্ন করে ভাব প্রকাশ করতে শিখেছে মানুষ। নির্মিত হয়েছে বাক্য। সেই বাক্য গেঁথে তৈরি হয়েছে মন্ত্র, শাস্ত্র, কাব্য, অনুশাসনমালা। এবং এই সবই প্রায়শই ব্যবহৃত হয়েছে দুর্বলতর শ্রেণিকে অবদমিত আর অধীন করে রাখবার জন্য। এই উপন্যাসে নারীর প্রতি পুরুষের নিষ্ঠুর প্রভুত্ববাদের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এ ব্যাপারে মানুষ বহু প্রজন্ম ধরে গড়েছে ভাষার শৃঙ্খল। প্রতিটি ধর্মশাস্ত্রে নারীর স্থান পুরুষের নিম্নতর তলে; সর্বপ্রকার সামাজিক অনুশাসনে নারী পুরুষের তুলনায় বঞ্চিত। এই ভাষার অধিকার পুরুষ নারীকে দেবে না বলেই নারীর বিদ্যার্জনকে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে শাস্ত্রে আর সমাজবিধিতে। নারীকে কথা বলতে দেওয়া হয়নি অনেকটাই গায়ের জোরে। নারীর সেই নীরবতা নিয়ে, অনুপস্থিতি নিয়ে আজ লেখা হচ্ছে বিশ্লেষণমূলক বই। তাই বলেছি 'কথা' আর 'না-কথা'র দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু।

দ্বন্দ্বটা কোথায়? যদি একদল শাসক, আর এক দল শাসিতই চিরকাল — তাহলে দ্বন্দ্ব তৈরিই হয় না। কিন্তু পরিস্থিতি তেমনভাবে অনড় থাকে না। সুযোগপ্রাপ্ত শ্রেণি অনেক সময়েই চায় না — তবু স্থিতাবস্থা বদলায়। সময়ের ধর্মই হল গতিমান থাকা; গতির ধর্মই হল ধাবনের পথে প্রতিক্ষণে কোনো না কোনো পরিবর্তন সূচিত করা। সেই সঙ্গে 'কথা'রও নিজস্ব একটা ধর্ম আছে। তা অনেকটাই জলের মতো। কথা-র গতি কখনোই রুদ্ধ করা যায় না। যেখানেই এতটুকু রন্ধ্র — সেখানেই উছলে উঠবে কথা। প্রতিবাদের বাণী, বিদ্রোহের ভাষা দেখা দেবেই কোনো না কোনোদিন। বাঁধ নিশ্ছিদ্র করে দিলে তা ভাঙবেই; দেওয়াল নীরন্ধ্র করবার চেষ্টা করলে সমস্ত দেয়ালই ধীরে ধীরে নিষিক্ত হবে অলক্ষ্য - সঞ্চারিত কথা - প্রবাহে। উপন্যাসের প্রথম দুটি বাক্য —'খানকার পীরসাহেব বলেছিলেন, এ জীবন ঘুমে যায়। একদিন জাগবি বেটি, দেখিস— কথা বলবি সেদিন।' —এই জাগ্রত প্রাণের কথাই হল প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদের কথা - বয়নই এই উপন্যাসের আখ্যান।

গ্রামের বিশিষ্ট চরিত্রের মধ্যে আছে জীবন ঘোষাল, লেখকের ভাষায় — 'জীবন ঘোষালের বয়স প্রায় পঞ্চান্ন, কিন্তু এখনও উদ্ধত যৌবনের ডাঁটো শরীর। গ্রামের দু দশ ঘর শাঁসালো যজমানি ছাড়াও জমি-ভিটে-একাধিক পুকুর সবই আছে ঘোষালের। কিন্তু তার আসল শক্তি বোধহয় সদর শহরে সেজ ছেলেকে হালে করে দেওয়া দেশি মদের দোকানটাই।' আরও দুই উল্লেখযোগ্য চরিত্র খোন্দকার আর খইবুর। সম্পন্ন মধ্যবিত্ত, লোভী, কামুক, অ-বিবেকী, সুযোগসন্ধানী, ছোটো মনের মানুষ। জীবন ঘোষালই এদের মধ্যে ভিলেন হিসেবে তুলনামূলক ভাবে অভিজাত। আছে আসরাফুল। মোটের উপর সাধারণ সচ্ছল পরিবারের বেকার - নিষ্কর্মা ছোটো ভাই। খানিকটা শ্লথবুদ্ধিও অর্থাৎ বোকা। মদ ও জুয়া — দুই নেশাই আছে কিন্তু স্ত্রী মোমেনা-র প্রভু হিসেবে নিজের অধিকার নিয়ে তার কোনো সংশয়ই নেই। আছে খোন্দকারের অনুগত ছায়াসঙ্গী অনাথ ছানু। আরও দু-তিনটি চরিত্র — যারা গল্পে প্রয়োজনে এসেছে — যেমন আনিসুর; মোমেনা-র মামা এন্তাজ; রাজনৈতিক সুবিধাবাদী ছোটো নেতা অসমঞ্জ নন্দী। আখ্যানের গতি নির্ণয়ে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে এরাই। পূর্বোক্ত মানুষগুলির ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ - সংবলিত এক একটি কথাবৃত্ত। মাঝে মাঝেই বৃত্তগুলির পরিধি একে অপরকে কেটে পরস্পরের ভিতরে ঢুকে গেছে। এভাবেই লেখা হয়েছে এই গ্রামের গল্পটি। থানার বড়োবাবু অখিলেশ মুখার্জি আর মেজোবাবু জাভেদ আবসার এই উপন্যাসে নির্ভরযোগ্য পুলিশ অফিসারের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছেন।

নারী চরিত্রগুলির ভূমিকা সক্রিয়তার দিক থেকে সংক্ষিপ্ত-পরিসর কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। আসরাফুলের মা ও আনিসুরের মায়ের ভূমিকা কম। কিন্তু খইবুরের বিবি সবেরা আর আসরাফুলের বিবি মোমেনাই এই উপন্যাসে প্রথম বাক্য ক'টি — পিরসাহেবের সেই উক্তি — 'একদিন জাগবি বেটি, দেখিস — কথা বলবি সেদিন।' দীর্ঘ নিপীড়িত আচ্ছন্নতার পর এই দুই নারীর জেগে ওঠা ও কথা বলবার মহান ঘটনাটিই এই উপন্যাসের শীর্ষবিন্দু।

পিরসাহেবের চরিত্রটিকে লেখক খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রামের একদিকে বৃক্ষলতায় ঘেরা পিরসাহেবের খানকা। উপন্যাসের শুরুতে, শেষে এবং মাঝে মাঝেই তাঁকে দেখানো হয়েছে। তিনি কথা বলেন। ধর্মের কথা। তাঁর কাছে ধর্মকথা আর উপদেশ শুনতে আসে মানুষ। তিনি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন — মুসলমানের এবং হিন্দুর। ধর্মকথার বহুল সম্ভার থেকে উদার মানবিকতার নির্যাসটুকু ছেঁকে নিতে পারেন যাঁরা তাঁদেরই প্রতিনিধিরূপে পিরসাহেব আছেন এই উপন্যাসে। অতি পরিচ্ছন্ন ঝকমকে তাঁর মাটির ঘর ও দাওয়া। সাহেবজান বিবি নামে এক নারী ও তার স্বামী থাকে তাঁর খানকার লাগোয়া। সাহেবজান পরিষ্কার রাখে তাঁর ঘর-দুয়ার; আধ্যায়ন করে অতিথিদের। পিরসাহেব আল্লাহ-র কথা বলেন। তাঁর ধর্মীয় দর্শনের অনুভাবনা উপন্যাসটির বয়নে মিশে আছে। একটা সময়ে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্তই বলা যায়, প্রাচ্যে তো অবশ্যই, পাশ্চাত্যেও দর্শনশাস্ত্রের সিংহভাগই ছিল ধর্মীয় দর্শন। কোনো কোনো দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত না হলেও আচরণ-বিধিকে ধর্মীয় অনুশাসনের মান্যতা দেওয়া হয়েছে সর্বত্র।

সেই সব ধর্মকথায়, যা এখনও আমাদের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার প্রায়শই এমন সব প্রতিপাদ্য থাকে — যা একটি অপরটির বিরোধী; একটি উপদেশ গ্রহণ করলে সেই শাস্ত্রেরই অন্য একটি উপদেশ গ্রহণ করা যায় না। এমন হওয়া স্বাভাবিক এই কারণে — ধর্মগ্রন্থগুলি কেউ একা বসে একটি নির্দিষ্ট সময়ে লিখে শেষ করেন না। অনেকদিন ধরে, অনেক সময়ে কয়েক শতাব্দী ধরে এক একটি ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মকেন্দ্রিক কাব্য গড়ে উঠতে থাকে। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও কবির দৃষ্টিকোণ একত্র হয় ধর্মগ্রন্থে। দ্বিতীয়ত, ধর্মগ্রন্থগুলির ভাষা প্রায়ই হয় দুরূহ, কখনো ঈঙ্গিতময় — সাধারণ জনের কাছে দুর্বোধ্য। তাই ধর্মশাস্ত্রের জন্য লেখা হয় টীকা - ভাষ্য। এই টীকাকারেরাও নিজস্ব ব্যাখ্যা জুড়ে দেন শ্লোকগুলির সঙ্গে। ফলে একটি ধর্মগ্রন্থ থেকে ঠিক কোন উপদেশ প্রাপ্তব্য এবং অনুসরণযোগ্য তা নির্ণয় করা সহজ নয়। এজন্য সাধারণ মানুষ প্রায়ই কোনো গুরুকে আশ্রয় করে নিশ্চিন্ত হতে চান। গুরু যেমন রুচি ও চরিত্রের মানুষ হন — তাঁর প্রদত্ত উপদেশ ও বিধানও তেমনই হয়। এ বিষয়ে বেশি বলা নিরর্থক। এই গুরুবাদের দেশে গুরুর ভূমিকা হতদরিদ্র সমাজ থেকে শুরু করে সমাজের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। খেতে না - পাওয়া আদিবাসীদেরও গুরু থাকেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীদেরও থাকেন; বিশ্বের সর্বাধিক ধনবান শিল্পপতিদেরও থাকেন।

কথা উপন্যাসের পিরসাহেবকে ঔপন্যাসিক মার্জনা করবেন, আমার বিশ্বাসযোগ্য লাগেনি। আদর্শের অভাবলয় যুক্ত অলীক মানুষ মনে হয়েছে। ধর্মশাস্ত্র আর ধর্মীয় দর্শন মন্থন করে ভালো ভালো কথা তুলে আনাই তাঁর কাজ যেন। তিনি ঈশ্বরে, আল্লাহ্-এ বিশ্বাসী, উদার মানবিক এবং আধুনিক মনের মানুষ। এই আদর্শ সমবায় সম্পূর্ণ সত্য হবার পক্ষে একটু সন্দেহজনক থেকেই যায়। উপন্যাস শেষে থানার বড়োবাবু ও মেজোবাবু যখন দোষীদের বার করে চালান দিচ্ছেন, তখন আইনের সেই সৎ পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়েছেন তিনি। গ্রামের মানুষের কাছে যেহেতু সাধু-সন্ন্যাসী, পির-দরবেশের যথেষ্ট প্রভাব থাকে— তাই গ্রামবাসীরাও সহযোগিতা করেছে এবং বেশ খুশি মনে মেনে নিয়েছে পুলিশের হস্তক্ষেপ। এই শেষ দৃশ্যটি বেশ জমাট ও 'সুখী সমাপন' -এর পরিবেশ রচনা করে। কিন্তু বাস্তবে অনেক সময়েই যা ঘটে — অর্থাৎ গ্রামে পুলিশ ঢুকে সদম্ভ তাড়নায় দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে কিছু লোককে পীড়ন ও গ্রেপ্তার করে — তেমন হলেও কি পিরসাহেবের কথাগুলি অপরিবর্তিতই থাকত!

বইয়ের ব্লার্ব-এ কথা উপনাসকে উত্তর আধুনিকতার লক্ষণযুক্ত বলা হয়েছে। কোন দিক থেকে 'উত্তর আধুনিক' বলা যেতে পারে এই উপন্যাসকে তা ঠিক বুঝিনি। অত্যন্ত সুচিন্তিত প্লট-এ, যুক্তি-শৃঙ্খলা-বিন্যস্ত ঘটনা-পরম্পরায় গেঁথে তোলা এই উপন্যাস। সুচিন্তিত আখ্যান-কেন্দ্র। প্লট-এর বিন্যাসটি এর পরেই আমরা পাঠকদের জন্য খুলে দিচ্ছি। সাধারণত উত্তর আধুনিকতার লক্ষণযুক্ত উপন্যাস - প্লটের মতো কেন্দ্র - হীনতায়। নির্দিষ্ট আকার - রেখা -বিহীনতায় ছড়িয়ে যাওয়া নয় এই উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে উত্তর আধুনিক উপন্যাসের গঠন-আকৃতি সম্ভবত সর্বাধিক পাওয়া যায় জীবনানন্দের উপন্যাসে। এই উপন্যাসের প্লট তার বিপরীত সংস্থানেই নির্মিত। উপন্যাসের আখ্যান-স্তরের সমান্তরাল এবং পিরসাহেবের ভাবনাতেই মূলত গড়েউঠেছে এক দর্শনের ভুবন। বলা যেতে পারে এক 'কথা'র পৃথিবী। কিন্তু এই দ্বিতীয় ভুবনের অস্তিত্ব সব পাঠকের কাছেই বিশ্বাসবহ, এমনকী প্রাসঙ্গিকও মনে হবে না। ধর্মকথা ছেড়ে অনেক আদর্শের বাণী তুলে আনলেও মানব-রচিত ধর্মকথায় ভেদবুদ্ধি এবং শ্রেণিশোষণের (সে শ্রেণি-বৈষম্য জাতি, ধর্ম, বিত্ত ও লিঙ্গ — যে কোনো দিক থেকেই আসুক) সমর্থন আছেই — এই সত্য অস্বীকার করা কি সম্ভব?

উপন্যাস শুরু হয়েছে নিম্নমধ্যবিত্ত মুসকিল পরিবারের নিষ্কর্মা ছোটো ছেলে আসরাফুল ও তার স্ত্রী মোমেনাকে দিয়ে। আসরাফুল মনে করে মোমেনার সে দণ্ডমুণ্ডের প্রভু। তার শরীর, মন, মর্যাদা এবং কণামাত্র গহনাও তারই সম্পত্তি। মোমেনা স্ত্রী, সেবিকা ও বাঁদি। সেই মতোই আসরাফুলের আচরণ। মোমেনাও নীরবে সব মেনে নেয়। সে কথা বলে না। পুরুষের মুখের উপর কথা বলতে সে শেখেইনি কোনোদিন। নীরবে, মোটের উপর আভ্যাসিক স্বস্তিতেই সে সব কাজ করে যায়। এই মোমেনাকেই তার শাশুড়ি জারিনা এনেছিল পিরসাহেবের কাছে। তার সমস্যা —বউটা এমন কেন? সবই করে, কিন্তু মুখে কথা নেই। সেই সূত্রেই পিরসাহেব বলেছিলেন — 'একদিন জাগবি বেটি, দেখিস —কথা বলবি সেদিন।' সমস্ত উপন্যাসে, শেষ লগ্নে একটি কথাই উচ্চারণ করেছে মোমেনা। এতদিনকার 'কথা'র নির্যাতনের বিপ্রতীপে মোমেনার একটি 'কথা' বিস্ফোরিত হয়েছে প্রতিবাদে। সে কথা যথাসময়ে।

মোমেনার শেষ গয়নাটি জুয়া ও নেশায় লাগাবার জন্য তুলে নিয়ে যায় আসরাফুল। মোমেনা প্রতিবাদ করে না; সে প্রতিবাদ শেখেনি। কিন্তু সেদিন যাবার সময়ে একটি সিকি মোমেনাকে দিয়ে যায় — রাত্রে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে মেলা দেখা ও যাত্রা শোনার কথা বলে যায়। মোমেনাকে আসরাফুলের প্রথম কিছু দেওয়া।

পরের দৃশ্য যাত্রার। 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' পালা। সেই দ্রৌপদী —যাকে পণ রেখে জুয়া খেলেছিল তার স্বামী। সমগ্র গোষ্ঠীর পুরুষকুল নীরব ছিল নারীর অপমানে। এই 'দ্রৌপদী' মোটিফ ভারতীয় গল্প-উপন্যাসে বহুবার ব্যবহৃত। স্বামীর নেশায়, স্বামীর সম্পত্তি বলে গণ্য হওয়া নারীর প্রতীক দ্রৌপদী। মহাভারতে আছে — তার মধ্যেও তিনি প্রতিবাদের কথা বলেছিলেন কয়েকটি। তাই প্রতিবাদিনীর প্রতীক রূপেও দ্রৌপদীকে গ্রহণ করা হয়েছে বাংলা সাহিত্য। মনে পড়বে মহাশ্বেতা দেবী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের কথা; বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা। এই উপন্যাসের প্রারম্ভেই 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ'। পালার মুগ্ধ দর্শক মোমেনার উপস্থাপনা দিয়ে মোটিফটি সেট করা হয়েছে।

তারপর গল্প গড়ায়। একাধিক কন্যা বলি হয়ে যায় পুরুষের কামনার আগুনে। বশিরের এক পুকুর মাছ ফলিডলের প্রয়োগে মরে ভেসে ওঠে জীবন ঘোষাল আর খউবুরের ষড়যন্ত্রে। চলে নারীদেহ কিনে নেবার শলা-পরামর্শ। উপন্যাস পরিণতির পথে এগোয়। জুয়ার নেশায় আকণ্ঠ-মজ্জিত আসরাফুল খইবুরের কাছে মোমেনা ও ঘরে বাসন পণ রেখে হেরে গিয়ে তাকে খইবুরের হাতে তুলে দেয়। খইবুরও আবার নিজে ভোগ করবার পর তাকে দেবে আনিসুরের হাতে। আনিসুরের কাছ থেকে টাকা খেয়েছে জীবন ঘোষাল, ভাগ পেয়েছে সে। খইবুর যখন দিনের আলোতেই ঘোষালের বাড়িতে দিন কয়েকের আশ্রয়ে থাকা মোমেনাকে নিয়ে নিজের বাড়িতে আসে তখন বোরখা-ঢাকা মোমেনাকে গাঁয়ের লোক তার বিবি ভেবে থাকতে পারে। কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই সে মুখোমুখি পড়ে যায় স্ত্রী সবেরা-র। স্ত্রীকে গোপন করবার কথা তার মনেও হয়নি।

কোনোদিন প্রতিবাদ না-করা সবেরা এবার বাধা দেয়। মার খেতে খেতেও বাধা দেয়। — 'আল্লাহ্‌র কৃপায় এই কজন খেয়ে-পরে আমরা বেশ থাকি সবাই এ বাড়িতে। এ গুনাহ আমি প্রাণে ধরে এখানে করতে দেব না তোমায়।' খইবুর তাকে ঠেলে দিয়ে মোমেনাকে ঘরে তোলে। সবেরা চিৎকার করে জানায় গ্রামের লোককে; খবর দেয় থানায়। তারপর থানার বড়োবাবু, মেজোবাবু এবং পুলিশ।

সবাই এসে জমা হয় পিরসাহেবের কানকায় ধীরে ধীরে জাল খোলে। আর সহসা মোমেনার উপলব্ধিতে উদ্ভাসিত হয় এই সত্য — তার স্বামী — যাকে প্রভু বলে সত্যিই তনুমন নিবেদন করেছিল সে একান্তভাবে — সেই আসরাফুলই তাকে জুয়ার বাজি ছাড়া আর কিছু ভাবেনি। তাকে তুলে দিয়েছে অন্য পুরুষের হাতে। তখনই সে এই উপন্যাসে তার একমাত্র উচ্চারিত 'কথা'টি হৃদয় ছিঁড়ে নিক্ষেপ করে দেয় আসরাফুলের দিকে। লেখক অত্যন্ত যত্নে, অতি মুনশিয়ানায় এই মুহূর্তটি নির্মাণ করেছেন। শব্দটির নির্বাচনেও আছে সুচিন্তিত ভাবনা। আমরা এই অংশটি একটু বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করছি :

> শুধু সেই সুবিশাল ধ্বংসস্তূপটার মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় মোমেনা। মুখের আবরণ খোলা অবস্থাতেই আসরাফুলের সামনে দু-এক পা এগিয়ে এসে সে ধীরে দাঁড়ায়। বোরখার ভেতর - পকেটে হাত ঢুকিয়ে বহুদিন আগে মেলা দেখার জন্য স্বামীর কাছে পেয়ে এতদিন পর্যন্ত যত্নে রেখে দেওয়া সেই অভিজ্ঞানের সিকিটাই বার ক'রে নিবিড় এক ঘৃণায় সজোরে ছুঁড়ে মারে সে আসরাফুলের গায়ে। সে নিবিড় ঘৃণার আঘাতে দুরন্ত এক লাভার উদ্‌গীরণ হয়ে যায় মুহূর্তে। সে উদ্‌গীরণের স্রোত বেয়েই চিরকালের কথা-না-বলা মেয়েটার মুখে বের হয়ে আসে একটি মাত্র ভয়ঙ্কর তীব্র কথা : তা-লা-ক্‌!

নিস্তব্ধতার মধ্যে উঠে পড়ে নতুন বিতর্ক — 'তালাক' শব্দ উচ্চারণ করা নারীর পক্ষে কি অনুশাসন - সম্মত ? এজন্যই আমরা লেখার শুরুতে বলেছিলাম ধর্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে ন্যায়ের ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা এক অসম্ভব প্রস্তাব। উপন্যাসের এই পর্বে ওই টানটান আতত মুহূর্তে কোন শব্দে ও কোন কর্মে নারীর বা পুরুষের — কার কতটা অধিকার তা নিয়ে পিরসাহেবের দীর্ঘ বাগবিস্তার সংগত লাগে না — বাহুল্য বাগাড়ম্বর বলেই মনে হয়।

আপত্তির আরও একটু জায়গা আছে। পুলিশ যখন গ্রেফতার করেই নিয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ চমৎকার শুদ্ধ বাংলায় আসরাফুলের পাপস্বীকার ও অনুশোচনা; তার প্রতিক্রিয়ায় মোমেনার তার দিকে অনিমেষ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা — খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। যে সবেরা কামুক, লম্পট, নিপীড়ক স্বামীকে নিজেই পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছে — সেই আবার তার জন্য ভালো উকিল দেবার প্রার্থনা কাতরভাবে পিরসাহেবের কাছে পেশ করেছে —এই দৃশ্যও যেন পুরুষের ইচ্ছাপূরণ। কোনোটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এমন স্তরের উপন্যাসে মানায়নি। এই ধরনের বিবর্তন যদি দিতেও হয়, তার জন্য ভিন্নতর পরিস্থিতি নির্মাণ প্রয়োজন। মনে পড়ে, কতদিন আগের লেখা মৈমনসিংহগীতিকা-য় প্রেমিক জয়চন্দ্র সাময়িক ভাবে অন্যাসক্ত হবার পর পূর্বপ্রেমিকা চন্দ্রাবতীর মন্দির-দ্বারে ব্যাকুল প্রার্থনায় হাহাকার করে, প্রাণ দিয়ে দিলেও চন্দ্রাবতী আর দরজা খোলেনি। পুরুষের অকথ্য অন্যায় ও অত্যাচার মর্জনা করবার জন্য নারী কি সর্বদাই তৎপর থাকবে? অনেক সময়ে যে সে তা থাকেও— তা অন্ন - বস্ত্র - বাসস্থানের দায়ে — তা কি অস্বীকার করবার?

আলোচনা শেষ করবার ঔপন্যাসিকের একটি 'মাস্টার স্ট্রোক' -এর উল্লেখ করি। মোমেনা - উচ্চারিত 'তালাক' শব্দটি ছাড়াও আর একটি অতি গভীর কথার কারুকার্য আছে এই উপন্যাসটিতে।

আসারাফুল পাপস্বীকার করেছে। কিন্তু আরও এক পাপকর্ম - সম্পাদক খইবুর তা করেনি। সে উচ্চারণ করেছে আর এক জাগতিক সত্য — তার অনেকগুলি বাক্যের (উপন্যাসটি একটু বেশিরকম কথা - নির্ভর) কয়েকটি তুলে দিচ্ছি—

- নিজের তৃষ্ণাটাকে ছাড়িয়ে গিয়ে ধর্মকে ভালোবাসে না এই পৃথিবীর কেউই।
- আসরাফুলও ধর্ম বা ঈশ্বর — কোনোটাতেই ফেরেনি সবেরা। মেয়েটাকে ওর আজও ভালো করে পাওয়া হয়নি বলে মেয়েটাতেই ফিরেছে মাত্র ও।
- তার (মানুষের) বাইরের যে ধর্ম আপন শরীরের তৃষ্ণারই খোঁজ পায় না, অত বড় সেই আত্মপ্রবঞ্চনাটার কথাই মিথ্যে করে বলে যেতে বলিস আমাকেও?
- মানুষের শরীর আগে ছিল, ধর্ম অনেক পরে এসেছে। ডালে উড়ে এসে বসা বাইরের পাখিটা গাছের জমাট ভিত্তির কি বোঝে।
- ধর্মটা সহজেই পাল্টাতে পারে মানুষ, কিন্তু তৃষ্ণাই যে আসল অমর।

এবং তার ঔপন্যাসিক লেখেন—

- পীরসাহেব প্রসন্ন হেসে বলেন, বাঃ, তুমি এমন করে তোমার ধর্মকে চিনেছো। এই স্রোতেই থাক। তোমার ভালো হবে। পৃথিবীর সমস্ত স্রোত যে একদিন সেই সমুদ্রেই যায়

পিরসাহেবের রাশীকৃত সদ্‌ধর্ম - উপদেশের তুলনায় এই স্বধর্ম - চেনার প্রশস্তিবাক্য অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য লাগে। সেই সঙ্গেই প্রশ্নও জাগে — তাহলে এত ধর্মকথা-র বিস্তার কেন উপন্যাসের বহু পৃষ্ঠা জুড়ে! এখানেও কি লেখক একটি কথা-র সংঘাত দেখাতে চেয়েছেন? অনুশাসনের ধর্ম আর জীবের স্বধর্মের মধ্যে সংঘাত!

উপন্যাসটি ভাবায়— তাতে কোনো সংশয় নেই। এই শেষ ভাবনাটিতেই কথা উপন্যাসটি পল্লি-সমাজের একটি গতানুগতিক উপন্যাসের অবয়ব থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে।